ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 249-255
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.204

কাব্যসৌন্দর্যের আলোকে ঈশোপনিষদ

মন্দিরা ডাঙ্গর, *প্রাক্তন ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Vedic knowledge reaches its perfection in the Upanishads. Upanishads reflect deep spiritual consciousness & advanced philosophical thought. Like the Vedas, the Upanishads are still considered to be philosophical works that reveal the deep secrets of human life and give spiritual peace. The sage of the *Ishopanishad* is in fact a poet, and the *Ishopanishad* is not only a philosophical work but is also full of poetic beauty. The basic principles of poetry are *Alangkara*, *Guna*, *Riti*, *Dwani*, *Rasa* etc. In the *Ishopanishad*, all these poetic principles have become unwanted materials in the voice of the sage without any effort, the strong philosophical expression of the Upanishad writer has taken the form of literature. All the elements of poetic beauty as expressed by the poets of poetry are present in full measure in the *Ishopanishad*.

Keywords: Upanishad, Ishopanishad, Philosophical work, poetry, Poetic Eliments, Poetic beauty

বেদের ন্যায় উপনিষদ নিয়ে আজও ধারণা যে, উপনিষদ মানব জীবনের গূঢ় রহস্যের প্রকাশক এবং আত্মিক শান্তিদানকারী দার্শনিক রচনা। উপনিষদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনা, উন্নত দার্শনিক চিন্তাধারা এবং ভূমানন্দলাভের উপায়। উপ- নি উপসর্গ পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে 'উপনিষদ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'উপ' এর অর্থ নিকটে, 'নি' শব্দের অর্থ অত্যধিক। এখানে 'সদ্' ধাতুর অর্থ হয় উপবেশন। অর্থাৎ গুরুর অতি নিকটে বসে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাই 'উপনিষদ'। 'উপনিষদ' শব্দের সহজ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা গুরুর খুব কাছে বসে শেখা হয়। বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থানটি সবচেয়ে শেষে আসে, এগুলি বেদান্ত নামেও পরিচিত। বেদান্ত হল ব্রহ্মের জ্ঞান। সর্বজনস্বীকৃত যে, এইগুলিই একমাত্র গ্রন্থ যা এই পৃথিবী এবং পরলোকে প্রকৃত শান্তির পথ দেখায়। ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য, আত্মার পরিচয়, পরকালের রহস্য, উপাসনার পদ্ধতি, উপাসনার মাধ্যমে অনন্ত গৌরব অর্জন, সৃষ্টির রহস্য, আত্মা ও পরমাত্মাকে দেখার উপায়, ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি- এই সমস্ত বিষয়, তাদের সন্দেহ এবং সমাধান উপনিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যার পাশাপাশি, কর্মবাদ, জীবনের মর্যাদা, একত্বের অনুভূতি (অদ্বৈত), অমৃতের আকারে সর্বজনীনতা এবং প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি এবং মৃত্যু (ধ্বংস) আকারে বৈচিত্র্যের অনুভূতিও উপনিষদে পাওয়া যায়। উপনিষদ কেবল দার্শনিক গ্রন্থ নয়, এগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, জীবনমূল্য এবং নৈতিক মানদণ্ডকেও প্রতিফলিত করে। প্রকৃতপক্ষে, চিন্তার বিভিন্ন স্রোতের উৎপত্তি উপনিষদের মধ্যে থেকেই। ফলস্বরূপ, তাদের অধ্যয়নও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর কেন্দ্রীভূত।

আত্মা ও ব্রহ্মের বিষয়বস্তু যেমন সাহিত্যিক, তেমনি দার্শনিকও বটে। একজন দার্শনিক তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুক্তি এবং দক্ষতা ব্যবহার করেন, অন্যদিকে একজন সাহিত্যিক কর্ম এবং আবেগ ব্যবহার করেন। উপনিষদকারের বিশেষত্ব হলো তিনি তার গভীর ব্যাখ্যায় কাব্যিক স্পর্শ যোগ করেন, যা গভীর দর্শনকে সুন্দর, স্পষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক

করে তোলে। তিনি উপলব্ধ ভাষাকে ইচ্ছামতো অভিযোজিত করে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেন। তিনি কখনও শব্দের নতুন অর্থ দেন, কখনও দুটি শব্দের সমন্বয়ে একটি নতুন বাক্যাংশ তৈরি করেন, কখনও চিত্রকল্প, প্রতীক, রূপক, উপমা এমনকি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে দার্শনিক নীতিগুলির মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উপনিষদে নিহিত ব্রহ্ম, জীব এবং প্রকৃতির রহস্যের গভীর আধ্যাত্মিক দর্শনকে সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করার জন্য উপনিষদের ঋষিরা কোনও চিন্তাভাবনা ছাড়া অযাচিতভাবেই কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক বিষয় যেমন অলংকার, রীতি, গুণ, ঔচিত্য, রস, ধ্বনি ইত্যাদি কেবল ব্যবহার করে ফেলেছেন। তাই সাহিত্যের একজন পণ্ডিতের কাছে উপনিষদ চিন্তার উপাদান হতে পারে। তবে ঋষি যেভাবে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনা পরিমাপ করেছিলেন, যে ভাষা বা পোশাকে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা পরিধান করেছিলেন, তা অবশ্যই সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তী সাহিত্যিকদের জন্য অনুপ্রেরণা বা অনুপ্রেরণার উৎসও বটে। পরবর্তী সাহিত্যিক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে এই প্রকাশ কখনও অক্ষরের, কখনও শব্দের, কখনও শ্রবণের, কখনও শ্রবণের রূপ ধারণ করে। যখন একজন ঋষি উপলব্ধি করেন যে আত্মাই সর্বনিয়ন্ত্রক এবং সর্বময় শাসক, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারণা প্রকাশের সাথে মিশে গিয়ে ঋষির চিন্তাভাবনার একটি স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠেছে, ঠিক যেমন একজন বুদ্ধিমতী মহিলার ব্যবহৃত অলংকারাদি প্রসাধনী তার সৌন্দর্যের সাথে মিশে যায় এবং তার সাথে অভিন্ন হয়ে যায়।

উপনিষদে মূলত ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ ঈশোপনিষদ। অষ্টাদশ মন্ত্রে নিবদ্ধ ঈশোপনিষদ শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিনশাখার অন্তর্গত চল্লিশতম অধ্যায়। এটি কেবল একমাত্র উপনিষদ যেটি বেদের প্রাচীনতম অংশ তথা মন্ত্রসংকলন সংহিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অন্যান্য উপনিষদগুলি বেদের পরবর্তী অংশ ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক অংশের সঙ্গে যুক্ত। গ্রন্থের আদি শ্লোক 'ঈশা বাস্যম্' শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে বলে এই উপনিষটির নামকরণ 'ঈশোপনিষদ' হয়েছে বলে ধরা হয়। আত্মতত্ত্বই এই উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য। আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য এবং নিত্য, অন্য বাকি সবই মিথ্যা এবং অনিত্য। এর প্রধান দার্শনিক বৈশিষ্ট্য হলো সীমিত পরিসরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করা। ফলে এখনও এই উপনিষদের অধ্যয়ন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে হয়। এটা সত্য যে, হিমালয়ের শিখরের মতো ঈশোপনিষদের উদাত্তদর্শন বিদ্বজ্জনদের মুগ্ধ করে। তাই এই উপনিষদের অন্তরে প্রবাহিত কাব্য মন্দাকিনী প্রায়শই উপেক্ষিত থেকেছে।

সুন্দরের ভাব সৌন্দর্য। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে 'সুন্দর' পদের ব্যুৎপত্তি যথা- "সুষ্ঠু উনত্তি আর্দ্রী করোতি চিত্তমিতি।"[১] কাব্যসৌন্দর্য শব্দে এখানে কাব্যসম্বন্ধীয় চারুত্ব বিধায়ক বস্তুগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী উপাদান নিয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতান্তরের শেষ নেই। সংস্কৃত কাব্যে কেউ অলঙ্কারকে প্রধান বলেন, কেউ রীতিকে, আবার কারো মতে রসই কাব্যের মূল বিষয়, কারো মতে আবার ধ্বনিই কাব্যের মূল তত্ত্ব। কাব্যের মূল উপাদান নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে রসপ্রস্থান, অলঙ্কারপ্রস্থান, গুণপ্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, ধ্বনিপ্রস্থান এবং বক্রোক্তিপ্রস্থান নামে প্রস্থান বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ কাব্যের প্রধান তত্ত্বগুলি হল রস, অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি। কাব্যের লক্ষণে আচার্য্য দণ্ডী বলেছেন- "শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"[২] ভামহাচার্য বলেছেন- "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।"[৩] মম্মটাচার্য্য বলেছেন- "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি।"[৪] বিশ্বনাথ আচার্য্য বলেছেন- "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"[৫] বস্তুত শব্দার্থ কাব্যের শরীর। রসের উপস্থিতি আত্মার ন্যায়। কাব্যে অলংকারের উপস্থিতি কটককুণ্ডলাদির ন্যায়।

ঈশোপনিষদে বিনা প্রয়াসে ঋষিকণ্ঠে এই সমস্ত কাব্যতত্ত্বগুলি অযাচিত উপকরণ হয়েছে এবং উপনিষদকারের দৃঢ় দার্শনিক অভিব্যক্তি সাহিত্যের রূপ ধারণ করেছে। বস্তুত ঈশোপনিষদের ঋষির অভিব্যক্তি পরবর্তী আলংকারিকদের দৃষ্টিতে কখনও অলংকারের রূপ ধারণ করেছে তো কখনও রীতি বা রসের। ঈশোপনিষদের কাব্যসৌন্দর্য নিম্নরূপে প্রতিভাত হয়-

কাব্যসৌন্দর্যের মুখ্য উপাদানই হল রস। রসতত্ত্ব সংস্কৃত সাহিত্য বিচারের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। রসসিদ্ধান্তের আদি প্রবর্তক হিসাবে ভরতমুনিকে মানা হয়ে থাকে। নাট্যাচার্য ভরতমুনি বলেছেন- "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।"[৬] রস শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয় যেমন পদার্থের রস অম্ল তেঁতো ইত্যাদি, আয়ুর্বেদের রস, সাহিত্যের রস, মোক্ষ বা ভক্তির রস। উপনিষদে রস শব্দ ব্রহ্মর জন্য বা পরমাত্মার জন্যই প্রযুক্ত- "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং

লব্ধাহহনন্দো ভবতি।"[৭] পরমাত্মা সচ্চিদানন্দে পূর্ণ। সেই রকম কাব্যে ব্রহ্মানুভব হিসাবে রসকে ধরা হয়। রসাত্মক বাক্য কাব্যই। রস শব্দে কেবল শৃঙ্গার করুণাদি রস নয়, রসের ভাব, রসাভাব, ভাবাভাস ইত্যাদিরও গ্রহণ করা হয়। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে-

"রসাভাবো তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেহপি রসনাদ্ রসাঃ।।"[৮]

পাঠক বা দর্শক যখন কোনো সাহিত্যকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন, তখন তাদের মনে যে আনন্দ বা ভাবনার সৃষ্টি হয়, তাকেই সাহিত্যে 'রস' বলে। ভরতমুনি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার রসের কথা বলেছেন। পরবর্তী আলংকারিকেরা শান্তরসকে নবম রস হিসেবে যোগ করেছেন।

ঈশোপনিষদের বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান তথা মোক্ষ। তাই এখানে মুখ্যরূপে শান্তরস উপস্থিত আছে। কিন্তু আত্মার অজ্ঞেয় সর্বব্যাপকত্ব রূপ প্রকাশের জন্য এখানে অদ্ভুত রসও পরিদৃষ্ট হয়েছে। আত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম প্রতিপাদনের জন্য ঈশোপনিষদে বিস্ময়ভাব এসেছে। যথা-

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।"[৯]

এখানে আত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অতীত বর্ণনার জন্য বিস্ময়ভাবের কারণে অদ্ভুত রস হয়েছে। ঈশোপনিষদে রসের অতিরিক্ত ভাবও বর্তমান। যথা-

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানিবিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরানমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।"[১০]

এখানে ঈশোপনিষদের শেষ মন্ত্রে অগ্নিবিষয়ক রতিবর্ণনার কারণ ভাব আছে।

কাব্যসৌন্দর্যে অলংকারের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। বামনাচার্য বলেছেন- "সৌন্দর্যমলংকারঃ।"[১১] অলংকারের লক্ষণে দণ্ডী বলেছেন- "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে।"[১২] বিশ্বনাথ আচার্য্য বলেছেন-

"শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্বন্তোহলংকারাস্তেহঙ্গদাদিবৎ।"[১৩]

শব্দালংকার এবং অর্থালংকার ভেদে অলংকার দ্বিবিধ। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস অলংকার কাব্যে নাদসৌন্দর্য সৃষ্টি করে। একস্থানে উচ্চারিত স্বরব্যঞ্জনের সমষ্টিভূত শব্দের পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে- "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেহপি স্বরস্য যৎ।"[১৪] ঈশোপনিষদে এর উদাহরণ যথা-

"যস্মিন্ সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।"[১৫]

এই মন্ত্রে অনেক ব্যঞ্জনের এক বা বহুবার উচ্চারণের কারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার আছে, যার লক্ষণে বিশ্বনাথ আচার্য্যের মত যথা -

"অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাহপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে।।"[১৬]

ঈশোপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনায় ঋষিকণ্ঠে নিজেই পরিকর অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে। যথা-

"স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।"[১৭]

এখানে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত সকল বিশেষণগুলি একই অভিপ্রায়যুক্ত অর্থাৎ তার গুণের দ্যোতক। এই অলংকারের লক্ষণে বিশ্বনাথ আচার্য্য বলেছেন-

"উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"[১৮]

কিন্তু আত্মা সর্বব্যাপী, এই ধারণাটি বোধগম্য করার জন্য, ঋষির অভিব্যক্তিতে বিরোধিতার চিত্রটি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হৃদয় হরণ করে। ঈশোপনিষদে আত্মার সর্বব্যাপকত্ব স্বরূপ বিরোধালংকারে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঋষিকবি। উদাহরণ যথা-

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।"[১৯]

এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব 'এজতি নেজতি', 'দূরে অন্তিকে', 'সর্বস্যান্তরস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ' এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মের মায়া হীন তথা মায়া যুক্ত জগতের কারণ স্বীকার করলে বিরুদ্ধধর্মও চলে যায়। সুতরাং এখানে বিরোধালংকার সৃষ্টি হয়েছে। যদি ঋষি কেবল বলতেন যে আত্মা সর্বব্যাপী, তাহলে তাঁর কথার কোনও সৌন্দর্য থাকত না। যাইহোক, ঋষি এই দ্বন্দ্বকে এমন এক মোহনীয় রূপ দিয়েছেন: এটি আত্মার সারাংশ ধারণ করেও অনেক দূরে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি আশ্চর্যতা রয়েছে এবং এটি আত্মার সর্বব্যাপকত্বকে আনন্দদায়ক উপায়ে প্রকাশ করে।

কাব্য সৌন্দর্যে গুণের স্থান অবশ্যই অনস্বীকার্য। বামনাচার্য বলেছেন– "কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মাঃ গুণাঃ।"[২০] ঈশোপনিষদে মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ গুণের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়। মাধুর্য্য গুণ কাব্যের এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে শোনামাত্র পাঠকের বা শ্রোতার মন ব্যাকুল এবং বিগলিত হয়। এই গুণ শব্দ ও অর্থের এমন এক মিশ্রণে তৈরি যা শোনামাত্র চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং যা বারংবার পড়া বা শোনা হলেও বিরক্তি জন্মে না। এখানে সমাসরহিত মধুর রচনাযুক্ত মাধুর্য্যগুণের উদাহরণ যথা-

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।"[২১]

অলঙ্কারশাস্ত্রে 'ওজঃ গুণ' শব্দ বা অর্থের এমন একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি, যা কাব্যকে তেজ ও বলিষ্ঠতা প্রদান করে। দণ্ডী ওজঃ গুণকে দশটি গুণের মধ্যে অন্যতম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ সমাসযুক্ত এবং যুক্তাক্ষর বহুল ওজঃগুণের উদাহরণ হিসেবে ঈশোপনিষদের এই উক্তিই যথার্থ–

"স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।"[২২]

প্রসাদ গুণের উদাহরণ যথা-

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।"[২৩]

এই মন্ত্র সরল সুবোধ পদের দ্বারা নিবদ্ধ। তাই এখানে প্রসাদ গুণ বর্তমান। বিশ্বনাথ আচার্য্য বলেছেন-

"সঃ প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ।
শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ।।"[২৪]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে 'রীতি' কাব্যরচনার শৈলী বা পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। রীতি হল সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা কাব্যের নির্দিষ্ট শৈলী এবং শব্দের সুশৃঙ্খল বিন্যাস। রীতিপ্রস্থানের প্রবক্তা আচার্য বামন রীতি বলতে তিনি পদরচনার পদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন। বিশিষ্ট পদরচনা রীতি। পদরচনা গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়। পদরচনার চমৎকারিত্বের জন্যই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয়। গুণ রীতির মুখ্য বিষয়। মুখ্য পদরচনা রীতি হচ্ছে তিনটি গৌড়ী, বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী। উপনিষদগুলিতে বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী ভেদে ত্রিবিধ রীতিই পরিদৃষ্ট হয়। বৈদর্ভী রীতি বিষয়ে সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"মাধুর্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈ রচনা ললিতাত্মিকা।
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে।।"[২৫]

বৈদর্ভী রীতির উদাহরণ যথা ঈশোপনিষদের এই উক্তি–

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।"[২৬]

গৌড়ীরীতির উদাহরণ যথা–

"স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।"[২৭]

এই মন্ত্র ওজঃ প্রকাশক বর্ণের দ্বারা নিবদ্ধ এবং সমাস বহুল। অর্থাৎ এখানে গৌড়ীরীতি বর্তমান। দর্পণকার এর লক্ষণে বলেছেন– "ওজঃপ্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ। সমাসবহুলা গৌড়ী।"[২৮]

কাব্য বিষয়ে ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবক্তা আনন্দবর্ধনাচার্য "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি"[২৯] বলে কাব্যের পরমতত্ত্ব ঘোষণা করেছেন। ধ্বনির সৌন্দর্য প্রতীয়মান অর্থে নিহিত। প্রতীয়মান অর্থ মুখ্যত ধ্বনি শব্দে অভিহিত হয়। যে প্রতীয়মান অর্থ কাব্যে প্রধান রূপে অবস্থিত হলে তাকে ধ্বনি বলে এবং সেই কাব্যকে উত্তম কাব্য বলে। আনন্দবর্ধনাচার্য্য বলেছেন-

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।।"[৩০]

যা বাক্যের বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রধান করে তোলে তাই ধ্বনি। এ ধ্বনি ত্রিবিধ- বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। এগুলির মধ্যে রসধ্বনি প্রধান, কারণ অন্য ধ্বনিদুটি রসেই পর্যবসিত হয়। আবার ধ্বনি দ্বিবিধ- অবিবক্ষিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য। লক্ষণামূল অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য এবং অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ভেদে দ্বিবিধ। আবার অভিধামূল বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ এবং সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। ঈশোপনিষদে বিভিন্ন ধ্বনি দেখা যায়। এখানে লক্ষণামূল অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনির উদাহরণ যথা-

"অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছতি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।"[৩১]

এখানে 'অন্ধেন' পদে এবং 'আত্মহন' পদে লক্ষণা আছে। 'অন্ধেন' পদের মুখ্যার্থ চক্ষুরহিত এবং 'আত্মহন' পদের মুখ্যার্থ আত্মানাশক। কিন্তু 'তমঃ' চক্ষুহীন এবং আত্মানাশক নয়। অর্থাৎ মুখ্যার্থ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বাক্যার্থ সিদ্ধ করার জন্য এই মন্ত্রে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনি আছে।

অভিধামূলার্থশক্তিমূল ধ্বনির উদাহরণ যথা ঈশোপনিষদের এই উক্তি-

"অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"[৩২]

এখানে 'বিদ্যা' শব্দের মাধ্যমে 'জ্ঞান' অভিহিত এবং 'অবিদ্যা' শব্দের দ্বারা 'কর্ম' অভিহিত। এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য জ্ঞান এবং কর্ম পদদুটির গুরুত্ব ব্যঙ্গার্থের মাধ্যমে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুর দ্বারা বস্তু এখানে ব্যঙ্গীভূত হয়েছে।

ঔচিত্য বিচার ভরতমুনির সময় থেকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কাব্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপে ঔচিত্যের প্রয়োগ করেন আচার্য ক্ষেমেন্দ্র। বক্রোক্তিতত্ত্বের মূল উক্তিবৈচিত্র্য তত্ত্ব। 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে কুন্তকাচার্য বলেছেন- "বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে।"[৩৩] ভূষণসামগ্রী উচিত স্থানে ধারণ করলে শোভাবৃদ্ধি হয়, তার ব্যতিক্রম করলে অনৌচিত্য বা দোষ ঘটে। যে বস্তু যেখানে উচিৎ, সেখানে সেই বস্তু রাখলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এখানে কাব্যের রস, অলঙ্কার, গুণ, রীতি ইত্যাদি যখন উপযুক্ত স্থানে সঠিক উপায়ে ব্যবহৃত হয় তখনই সেটি ন 'ঔচিত্য' পদবাচ্য লাভ করে কাব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আচার্য আনন্দবর্ধন পদ, বাক্য, উপসর্গ, নিপাত প্রভৃতির আধারে যেমন ধ্বনির ভাগ করেছেন, ঠিক সেইভাবে ক্ষেমেন্দ্র পদৌচিত্য, বাক্যৌচিত্য, লিঙ্গৌচিত্য, বচনৌচিত্য, ক্রিয়া ঔচিত্য রূপে ঔচিত্যের অনেক ভেদ প্রদর্শন করেছেন।

ঈশোপনিষদও বক্রোক্তিতত্ত্বে নিবদ্ধ। ঋষি এই গ্রন্থে কেমন ঔচিত্য পালন করেছেন তার দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যথা-

"যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।"[৩৪]

এখানে মন্ত্রে বাক্যবক্রতা আছে।

ঔচিত্য কাব্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত। ঔচিত্য উচিৎ শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন। ঔচিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যথা ঈশোপনিষদের প্রথম উক্তি–

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।"[৩৫]

এই মন্ত্রে 'যৎ কিঞ্চ' এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে অখিল জগতের চিত্র প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এটা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে এই লিঙ্গৌচিত্য ঋষিকণ্ঠে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। আবার এই মন্ত্রে 'গৃধ্' ধাতু ছাড়া অন্য ধাতুপ্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়নি। 'যাচ্' ইত্যাদি ধাতু সমূহের প্রয়োগ করা যেত, কিন্তু ঋষির অভিপ্রায় প্রকাশিত হতো না। অর্থাৎ এই মন্ত্রেও ক্রিয়ার ঔচিত্যও বর্তমান।

বস্তুত এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, পরবর্তীকালে কাব্যশাস্ত্রকার কর্তৃক প্রতিপাদিত কাব্যসৌন্দর্যের সকল উপাদান ঈশোপনিষদে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ঈশোপনিষদ সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মহত্ত্বপূর্ণ কবিকৃতি এবং এর কাব্যিক অধ্যয়নের মাধ্যমে এর নিহিত গভীর দর্শন জানতে পারা যায়। উপনিষদের এই মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্যিক দিকটি প্রথমদিকে পণ্ডিতদের দ্বারা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। মনে হয় হিমালয়ের মতো উপনিষদের মহৎ দর্শন সর্বদা পণ্ডিতদের মোহিত করেছে, ফলে তার ভেতরে প্রবাহিত কাব্য মন্দাকিনী তাঁদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত বলে ধরা হয়নি। কিন্তু ঈশোপনিষদের রচনাশৈলী দেখায় যে কাব্য এবং কাব্যশাস্ত্র, দর্শন এবং কাব্য একে অপরের বিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক। ঈশোপনিষদের ঋষি একজন কবি এবং তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরমানন্দে সুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং ঈশোপনিষদ কেবল দার্শনিক গ্রন্থ নয় পরন্তু কাব্য সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ একথা না বললে দোষ হবে।

তথ্যসূত্র:

১. আপ্তে, শিবরাম বামন। সংস্কৃত শব্দকোশ। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, পৃ. ৩৭৩।
২. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। কাব্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, কাব্যাদর্শ- ১/১০।
৩. তদেব, কাব্যালংকার- ১/৬।
৪. শর্মা, শ্রীনিবাস। কাব্যপ্রকাশ (সম্পূর্ণ)। ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, বারাণসী, কারিকা- ১/৪।
৫. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ১/৩।
৬. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। কাব্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪,নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
৭. স্বামী গম্ভীরানন্দ। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী- ৭।
৮. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ৩/২৫৬।
৯. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৪।
১০. তদেব, মন্ত্র- ১৮।
১১. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। কাব্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪,কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি- ১/১/২।
১২. তদেব, কাব্যাদর্শ- ২/১।
১৩. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ১০/১।
১৪. তদেব, কারিকা- ১০/৩।
১৫. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৭।
১৬. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০০৩, কারিকা- ১০/৪।
১৭. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৮।
১৮. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ১০/৭৫।
১৯. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৫।
২০. কাব্যালংকারসূত্র- ৩/১।
২১. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৫।
২২. তদেব, মন্ত্র- ৮।
২৩. তদেব, মন্ত্র- ১।
২৪. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ৮/৮।
২৫. তদেব, কারিকা- ৯/২।
২৬. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৭।
২৭. তদেব, মন্ত্র- ৮।
২৮. আচার্য, বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩, কারিকা- ৯/৩।
২৯. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। কাব্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, ধ্বন্যালোক- ১/১।
৩০. তদেব, ১/১৩।

৩১. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৩।
৩২. তদেব, মন্ত্র- ৯।
৩৩. ত্রিপাঠী, ড: রমাশঙ্কর। ঔচিত্যবিচারচর্চা। চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ২০১০, বক্রোক্তিজীবিত, কারিকা- ১/১০।
৩৪. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪, মন্ত্র- ৬।
৩৫. তদেব, মন্ত্র- ১।

সহায়ক গ্রন্থসূচি:

১. আচার্য বিশ্বেশ্বর (ব্যাখ্যাকার)। কাব্যপ্রকাশঃ। জ্ঞানমণ্ডল লিমিটেড, বারাণসী।
২. আচার্য বিশ্বনাথ। সাহিত্যদর্পণ:। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩।
৩. আপ্তে, শিবরাম বামন। সংস্কৃত শব্দকোশ। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী।
৪. ঈশাদি নৌ উপনিষদ্ (শঙ্করভাষ্যার্থ)। গীতা প্রেস, গোরখপুর।
৫. ত্রিপাঠী, ড: রমাশঙ্কর। ঔচিত্যবিচারচর্চা। চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ২০১০।
৬. ত্রিবেদী, মাতৃদত্ত। অথর্ববেদ এক সাহিত্যিক অধ্যয়ন। বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিকশোধ সংস্থান, হোশিয়ারপুর।
৭. বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, কলকাতা, ২০০৫।
৮. শর্মা, শ্রীনিবাস। কাব্যপ্রকাশ (সম্পূর্ণ)। ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, বারাণসী।
৯. স্বামী গম্ভীরানন্দ। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা।
১০. স্বামী জুষ্টানন্দ। ঈশোপনিষদ্। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৪।
১১. সিংহরায়, জীবেন্দ্র। কাব্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪।